

কুঁজোপানা মানুষ ভগীরথ মিশ্র

আমি তাকে দেখতেই পাইনি, অথচ যখন দেখতে পেলুম, সে দাবি করল, সে নাকি অনেকক্ষণ ধরে আমার পিছু পিছু হাঁটছে! আসলে, মেলার মধ্যে আমি হাঁটছিলুম অন্যদের সঙ্গে। তারা আমার ছলেবেলার বন্ধু। বহুদিন বাদে দেখা। আমি একেবারে ডুবেছিলুম ওদের মধ্যে।

মেলাটা জমেও উঠেছে খুবই। পাঁপর-ভাজা, ফুলুরি-বেগুনি, ঘুগনি, খাজা-গজা, বোঁদে-জিলিপি, গন্ধে ম-ম করছে বাতাস। এই গন্ধটাও ভারি মনমাতানো আবহ, আমার কতকালের চেনা। পুরো ছেলেবেলাটা যেন মিশে থাকে ওই হাওয়ায়। পুরো কৈশোর জুড়ে মেলাটা আমাদের স্বপ্নের মধ্যে থাকত। এখনও থাকে। হাজার সমস্যায় জর্জরিত আমাদের গ্রামটা, ওই কটা দিন আচমকা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

বয়স আমার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছুই। আমাদের স্বপ্নের মেলাটাকেও। চাকরিসূত্রে গ্রামছাড়া বহুদিন। হাজার কাজের চাপে মেলার সময়টাতে গাঁয়ে আর আসা হয়ে ওঠে না। গাঁয়ের স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে মনে। ছেলেবেলার বন্ধুরা, আকৈশোর ওদের সঙ্গে দিনরাত হাজারো দুষ্টুমি, সেসব যেন কতকালের স্মৃতি বলে মনে হয়! বন্ধুরাও সংসারী হয়েছে। হাজার কাজের শেকলে বেঁধে ফেলেছে নিজেদের। কেউ কেউ আমার মতই গাঁ-ছাড়া। চাকরি-বাকরি করে দূরে দূরে। কালেভদ্রে দেখা হয়। আর, যারা গাঁয়ে রয়েছে এখনও, তাদের মধ্যেও অনেকেই সফল মানুষ। ক্লিৎ গাঁয়ে গেলে সববারেই যে ওদের সঙ্গে দেখা হয় তা নয়। তবে যোগাযোগটা পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। আর, আমি খুব উঁচুদরের একটা চাকরি করি বলে ওরা আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করে, আমি জানি।

মেলার মধ্যে চার বন্ধুতে হাঁটছিলুম, গল্প করছিলুম...। কতকালের গল্প সে-সব। শ্যাওলা জমেছে গায়ে। একেবারে মজেছিলুম আমরা। খেয়ালই করিনি, সে কতক্ষণ ধরে হেঁটে চলেছে আমাদের পিছু পিছু।

বলল, খেয়াল করবে কী করিয়া? তুমি তো পিছু ফিরে তাকাওনি একবারের তরেও।

তা অবশ্য তাকাইনি। তবে তাকালেও খুব কিছু হত না। কারণ, দেখামাত্তর ওকে চিনে ফেলা তো আর সম্ভব ছিল না। আমি নয়, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করল ও-ই। বলল, তুমি এখন কত বড় মানুষ, আমার মত নগণ্য লোককে চিনা তুমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি তখন মনে মনে ভাবছিলুম একটাই কথা। আমি একবারের তরেও পিছু ফিরে তাকাইনি, ওর এমন মন্তব্যটা কি অতটাই সোজা-সরল, যা ওর মতো মানুষের মুখে মানিয়ে যায়? আমার সফল জীবনের প্রতি, গ্রাম ছেড়ে পরবাসী হওয়ার প্রতি, গ্রামের দিকে ফিরে না তাকানোর প্রতি, মনে মনে কোনও অভিমান জড়িয়ে নেই তো ওই রহস্যময় মন্তব্যে? আর, তখনই মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায়, প্রাইমারি স্কুলে পড়াকালীন, রহস্যময় কথা বলায় ওর জুড়ি ছিল না। কথায় কথায় ধাঁধা আর প্রবাদ বলতে পারত মুড়ি-মুড়কির মতো। অভ্যেস কি মানুষকে পুরোপুরি রেহাই দেয়? আমি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি ওর মুখ, চোখ...কপালের বলিরেখাগুলি...। ধীরে ধীরে আমার চোখদুটো ফ্রেনের মতো নেমে আসে ওর শরীর বেয়ে। এবং আমি দেখতে থাকি ওর পুরো অবয়ব। রোগাসোগা চামচিকেপানা গড়ন, হাঁটু অবধি আধ-ময়লা ধুতি, নীল রঙের হাফশার্ট, পায়ে সস্তা চপ্পল, সারা শরীর জুড়ে অপুষ্টির ছাপ...।

আমাকে নাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে, সে সামান্য অস্বস্তি বোধ করে বুঝি। আমার মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরাতে চায়। বলে, জয়া বউদি কেমন আছে? আনোনি সঙ্গে? অন্তত ছেলেটাকে তো আনবে। ভারি মিষ্টি নাম তুমার ছেলের। কিং। আমার ছেলেটা শুনিয়া অবধি বায়না ধচ্ছিল, ওই নামটা অর্ চাই। বলি, চাইলেই কি সব পাওয়া যার রে এই দুনিয়ায়? সে হইল রাজার ছেইল্যা, তাকে উ-নাম মানায়। তুই হইলি খেত-মজুরের ব্যাটা, কিং তোকে মানাবেও-নি, সহিবেও-নি। কিং মানে তো রাজা?

জবাব দেব কি, আমি মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছিলুম ওর গুছিয়ে কথা বলবার ধরন। ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি হচ্ছিল এটাই ভেবে যে, ও আমার বউ-ছেলের নাম অবধি জানে, অথচ আমি ওর নামটাই মনে করতে পারছিনে।

—আমার নামটা তুমার মনে থাইকবার কথা নয়। সে বলল, —কিন্তু ওই ছড়াটা তো মনে থাকা উচিত। অই যে, পাখির ছানা, নকুলদানা, মনে নাই?

আর, সঙ্গে সঙ্গে তার নামটা স্মৃতির দরজায় ঘা মারতে থাকে অবিরাম। ওর নাম, নকুল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আরও কত কথাই। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় কত সরল ছিল নকুল! কত বন্ধুবৎসল! আমাদের অনুরোধে কত কঠিন কঠিন কাজ করে ফেলত হাসিমুখে! তরতরিয়ে গাছে উঠে কাঁচা আম পেড়ে আনত। পুকুরে নেমে পদ্মচাকি তুলে আনত। আর, যতক্ষণ সঙ্গে থাকত, সবাইকে হাসিয়ে মারতো।

বলি, তো, পিছু পিছু হাঁটছিলি কেন তখন থেকে? ডাকিস্-নি কেন?

নকুল খুব করুণ হাসে, তুমরা সব গল্পে মশগুল ছিলে...

বলি, তাতে কি? তোরও তো বন্ধু ওরা। আমরা তো সবাই একসঙ্গে কাটিয়েছি ছেলেবেলা।

—তা অবশ্য ঠিক। বিড়বিড় করে বলে ও।

কিন্তু ওর চোখের ভাষা পড়ে ফেলতে পারি নিমেষে। আমার আবেগপূর্ণ কথাগুলো ওর বুক অবধি পৌঁছতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে কোথাও। বুকের মধ্যে থেকে সায় পাচ্ছে না পুরোপুরি। খুব করুণ হেসে বলে, তেবে তুমরা এখন কত বড়, কত উচ্ছে! এখন তুমি হইলে মথুরাপতি কৃষ্ণ।

ওর কথা শুনে মজা পাই। বলি, আর তুই?

—যদি স্বীকার কর তো, সুদামা। খুব অভিমান জড়ানো গলায় কথাগুলো বলে নকুল।

হয়তো-বা ওর এই অভিমান স্বাভাবিক। কারণ, ছেলেবেলার বন্ধুদের কাছ থেকে সম্ভবত ভালো ব্যবহার ইদানীং পায় না ও। আনন্দ, নিরাপদ, শ্যামল, অতীন, যখনই গাঁয়ে আসি এদের সঙ্গে দেখা তো হয়। পুরনো বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করলে ওদের সারা মুখ তেতো হয়ে যায়। বলে, ভালো-মন্দ মিশিয়েই আছে সবাই। যারা আয়-উপায় কত্তিছে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। অদের সাথে দেখা হইলে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা হয়। কিন্তু যারা অভাবে-অনটনে রয়েছে, মুটে-মজুরি করে-টরে, কালেভদ্রে দেখা হইয়া গেলে খালি ছেলেবেলার সম্পর্কের কথা তুলিয়া সাহায্য চায়। অদের সঙ্গে মেশামেশি সেই কারণেই ইদানীং আর নাই বললেই চলে।

নকুলের পিঠে মোলায়েম হাত রাখি আমি। নরম গলায় বলি, চাকরির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কী-রে? চল, কোথাও গিয়ে বসি।

মেলার একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে একচিলতে ফাঁকা জায়গা দেখে বসি দুজনে। বলি, কেমন আছিস?

আকাশের দিকে চোখ বিঁধিয়ে বসে থাকে নকুল। একসময় বলে, অন্য কেউ জিগালে এমন কথার জবাবে, ‘ভালো’ বলিয়া দিই। কেন জান? দুটো কারণে। প্রথম কথা হইল, এটা আদর্শে কোনো প্রশ্নই নয়। লিহাতাই কথার কথা। প্রশ্নটা করে বটে, তবে এমন প্রশ্নের জবাব কেউ আশা করে না। তবে প্রশ্ন যখন কল্প, জবাব একটা দিতেই হয়। ভদ্রতার প্রশ্ন। কাজেই বলিয়া দি ‘ভাল’। কেন কি, ‘খ্যারাপ’ বললেই তো ফের অন্য হ্যাঁপা। আমি ভালো আছি শুনলে সবাই খুশি। চলিয়া যায় যে-যার কাজে। কিন্তু ভালো নাই বললেই তুমার আর রিহাই নাই। তখন তুমাকে বিতাং করিয়া কহিতে হবে, তুমার খ্যারাপ থাকার গল্প। কী খ্যারাপ, কবে থেকে খ্যারাপ, কেন খ্যারাপ...। তুমার বলা শেষ হইলে-পর সে কিন্তু আর এক মুহূর্তও দাঁড়াবে-নি। কোনো একটা জরুরি কাজের অছিলায় কাটিয়া পড়বে। যদি বল, শুনবে-নি তো জিগায় ক্যান? তো বলি, জিগায় ভদ্রতাবশে। সেটাই দস্তুর। এবং এও জানে, এমন প্রশ্নের জবাবে সঙ্কলে ‘ভালো আছি’ই কহিবে। কয়ও পনেরানা মানুষ। কিন্তু ওই বাকি এক আনা মানুষ যখন কয়, ভালো নাই, তখনই হয় মুশকিল। তখন, যে-কিনা কথাটা জিগালো, সে মনে মনে হাত কমড়ায়, কিনা, ইস, এখন জোয়ারের সময়, কত কাজ, লোকটা যে কতক্ষণ ভ্যাজরভ্যাজর করবে! এইসব কারণে আজকাল কেউ ‘কেমন আছ’ জিগালে বলিয়া দেই, ভালো আছি। কিন্তু তুমার ক্ষেত্রে তো আর সেটা চলবে-নি। তুমি আমার ছা-বেলার বন্ধু। তুমার সাথে তো আমার ভদ্রতার সম্পর্ক নয়। কাজেই তুমার পাশ সত্যি কথাটাই কহিতে হবে। ভালো নাই, ভাই। এক্ষেত্রেই ভালো নাই।

বাহ! আমাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়, গুছিয়ে কথা বলাটা দারুণ রপ্ত করেছে নকুল। ছেলেবেলা থেকেই ওর মধ্যে ব্যাপারটা ছিল, কালে কালে আরও পোক্ত হয়েছে। আর, সেই কারণেই, নকুলের কথাগুলো শুনতে শুনতে এক ধরনের আশঙ্কা কাজ করে চলে মনের মধ্যে। বারবার মনে হচ্ছিল, এ কেবল অকারণে কথার জাল বোনা তো নয়। একটা গূঢ় উদ্দেশ্যও নির্ঘাত কাজ করেছে অন্তরালে। আমার এমনতরো ধারণার খুবই সঙ্গত কারণ রয়েছে। একটা ভালো চাকরি করবার সুবাদে আমার যে বেশ সচ্ছল অবস্থা, এটা গ্রামের প্রায় সব মানুষই জানে। কাজেই, কালেভদ্রে গ্রামে গেলে, গরিব-গুরবোর দল, যারা এককালে কোনও না কোনওভাবে আমাদের সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, কোনও একটা বায়নাঙ্কা নিয়ে আসেই। এটা দাও, ওটা দাও...। বড় ছেলের চাকরি, ছোট ছেলের পড়ার খরচ, বউয়ের চিকিৎসার খরচ...। যে-ক’দিন থাকি, একেবারে জ্বালিয়ে খায়।

এতক্ষণে আমি সন্তর্পণে চোখ রাখি নকুলের মুখের ওপর। খুঁটিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, তেমন কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য লেপটে রয়েছে কিনা ওর আপাত কথাশিল্পের

মধ্যে। বুঝতে পারিনে। ফলে মনের মধ্যে চাপা অস্বস্তিটা চরে বেড়ায়। ভদ্রতাবশত শুধোই, ভালো নেই কেন?

নকুল ত্রিয়মাণ হাসে, তার কি একটা কারণ? গরিবের জীবনে ভালো না থাকার হাজারটা কারণ থাকে। সেগুলো অন্যকে বলাও যা, না-বলাও তা। তবে যেটা আমাকে পলে পলে দক্ষিয়া দক্ষিয়া মারছে, তা হইল, ছেল্যাটাকে পড়াতে পারলাম-নি। ক্লাস ফাইভের পর থামিয়া যাইতে হইল।

মন বলছিল, বেশ আটঘাট বেঁধে এগোতে চাইছে নকুল। একেবারে, চাল দাও, টাকা দাও, কাপড় দাও গোছের ভিক্ষাবৃত্তি নয়, আরও শক্ত, পাকাপোক্ত ঘাটে বাঁধতে চাইছে নৌকোটি। সম্ভবত ছেলেবেলার সম্পন্ন বন্ধুর থেকে নিজের ছেলের লেখাপড়ার খরচটা বাগিয়ে নেবার মতলব। তাও স্রেফ ভদ্রতাবশতই শুধোতে হয়, ছেলের লেখাপড়াটা বন্ধ করে দিতে হল কেন? বই-পড়রের অভাবে? এখন তো স্কুলে মাইনেপাতি লাগে না।

নকুল একটুক্ষণ কী যেন ভাবে। বলে, বইপড়র, মাইনার বেপারও আছে, তার চাইতে বড় কথা, সংসার চলবে কী করিয়া? ভত্তি করিয়া দিছি সাউদের বাখুলে। গরুবাছুর চরায়, খায় দায়...। মাইনা বাবদ যা-যেটুকু পায়, অভাবের সংসারে সেটাই কত!

মুখের কথা থেকে কোনও আন্দাজ পাচ্ছিলুম না নকুলের মনোগত ইচ্ছার। ঠিক কী চাইছে ও? বইপত্র চায় না, বুঝলুম। তবে কি ও মনে মনে চাইছে, আমি ওর সংসারটা চালাবার টাকা জুগিয়ে ওর ছেলের লেখাপড়ার সমস্যার সুরাহা করে দিই? ঠিক-ঠিক বুঝতে পারিনে বটে, তবে মনে মনে প্রস্তুত থাকি। আমি জানি, তেমনভাবে চেপে ধরলে, একেবারে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। একে তো ছেলেবেলার বন্ধু, সহপাঠী, তার ওপর, আমাকে সত্যিই খুব ভালোবাসত ছেলেবেলায়। সত্যি কথা বলতে কি, ওকে কিছু দিতে ইচ্ছেও করছিল আমার। ওর দুরবস্থা দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। ছেলেবেলায় কতই না ফ্যাক খেটেছে আমাদের জন্য। সম্পন্ন বাড়ির ছেলে ছিলাম, শারীরিক ক্লেশ হয় এমন কোনও কাজই করতে চাইতুম না আমরা, অর্থাৎ আমি, আনন্দ, নিরাপদ...। নকুলই হাসিমুখে করত সেই কাজ। হ্যাঁ, হাসিমুখেই করত। আমাদের থেকে কেড়ে নিয়ে করত। বলত, তুদের মাছ-মাংস-দুধ-ঘি খাওয়া শরীর, অত কষ্টের কাজ সইবে-নি। এখন মনে হয়, ওই ছেলেবেলায়ও, আমাদের ভেতরে একটা সুবিধেবাদী মানুষ বেঁচে ছিল। নকুলের মতো খেত-মজুরের ছেলেকে যে নিজেদের দলভুক্ত করেছিলুম, আমাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরির অধিকার দিয়েছিলুম,

তার মধ্যে যত না ছিল বন্ধুত্বের টান, তার চেয়েও ঢের বেশি ছিল প্রচ্ছন্ন স্বার্থ। কিনা, নকুল সঙ্গে থাকলে আর চিন্তা নেই। আমাদের জন্য সে অবলীলায় গাছে উঠবে, পুকুরে ঝাঁপাবে, গেরস্থের বেড়া ভেঙে ফল-পাকুড় চুরি করবে, কোথাও ফিস্টি খেতে গেলে, স্বেচ্ছায় সানন্দে আমাদের এঁটো পাতাটাও তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসবে নিজেরটির সঙ্গে। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ওইসব দিনে নকুলের ঘাড়ে চড়ে সবক্ষেত্রে বৈতরণী পার হওয়াটাকে মনে মনে বেশ রেলিস করতুম আমরা। অ্যাডিন বাদে তার জন্য অবশ্যই মনে মনে লজ্জা বোধ করি, আর সেই কারণেই যে-কোনও অজুহাতে নকুলকে কিছু অর্থ সাহায্য হিসেবে দিতে ভালোই লাগবে আমার। তার চেয়েও বড় কথা, বড় চাকুরে হিসেবে সারা গ্রামে এমনই একটা নামডাক হয়েছে, অথচ ছেলেবেলার গরিব বন্ধু কত আশা করে হাত পাতল, কিন্তু আমার হাত দিয়ে জল গলল না, এতে আমার আত্মমর্যাদার হানি তো ঘটবেই। যে শুনবে, একেবারে ছি-ছি করবে। হাজার হোক, সমাজে বাস করতে হলে লোকনিন্দা-লোকলজ্জার ব্যাপারটা ভাবতে হয় বৈকি। কাজেই আমি মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকি। চাইলে-পরে কিছু টাকা দিতেই হবে নকুলকে। কেবল টাকার পরিমাণ নিয়ে মনের মধ্যে চলতে থাকে টানাপোড়েন।

—হ্যাঁ, ভালো কথা...। আমি খুব ভাবনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছিলুম বুঝি। একেবারে ডুবন্ত মানুষকে তুলে আনবার ভঙ্গিতে হ্যাঁচকা টান মারে নকুল, —তুমার সেই কাঠ-মল্লিকার চারা পাওয়া গেছে।

—কাঠ-মল্লিকার চারা! আমি অবাক চোখে তাকাই ওর দিকে।

—বা রে, ভুলিয়া গেছ? একটা কাঠ-মল্লিকার চারা জোগাড় করিয়া দিবার তরে কতদিন ধরিয়া বলতে আমাকে, মনে নাই? সেই যে আমরা, কিলাস-থ্রি'তে বোধকরি পড়ি তখন, একদিন দল বাঁধিয়া ওলদা-চণ্ডীর জঙ্গলে গেলাম সঙ্কলে। আমি, তুমি, শ্যামল, অতীন..., জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা মউল গাছের তলায় গিয়া বসলাম। চারপাশটা ভুরভুর কচ্ছিল কাঠ-মল্লিকার ফুলের গন্ধে। গন্ধটা লিতে লিতেই তুমি বায়না ধল্লে, এই গাছের চারা একটা তুমার চাই। আর, ওই বইসে তুমাদের কোনো একটা জিনিস চাই মানে কী? কার উপর সে জিনিসটা জোগাড় করবার ভার পড়ত?

এটা ঠিক। ওই বয়েসে যা-কিছু দুর্লভ সামগ্রীর জন্য নকুলই ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা। এবং ঝাপসাভাবে যেন মনে পড়ল, জঙ্গলে তো প্রায়ই যেতাম, একবার যেন ওই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলুম আমি। তবে কাঠমল্লিকার জন্য কিনা তা আর অ্যাডিনবাদে মনে নেই।

— কী, মনে পড়িচ্ছে-নি? ওই যে, সেবার কেশিয়াড়ি বাসস্ট্যাণ্ডে দেখা হইল, তুমি বাড়ি থেকে কলকাতা ফিচ্ছিলে, তখনও তো কইলে ওই গাছটার কথা।

আমি নকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনোগত ইচ্ছেটাকে চিনতে চাইছিলুম। বেচার! আমি মনে মনে হাসি। সামান্য কিছু অর্থ কিংবা আনুকূল্যের প্রত্যাশায় কতখানি গ্রাউন্ড-ওয়ার্ক করে চলেছে তখন থেকে! মুখে বলি, বলেছিলুম বুঝি? কতদিন আগে বল্ তো?

নকুল একটু ভেবে বলে, তা বছর আট-দশ তো হবেই।

আমি যারপরনাই বিস্মিত, বলিস কি! আট-দশ বছর আগের কথা... তোর মনে আছে এখনও? আমি তো নিজেই ভুলে গিয়েছি। বলতে বলতে এতক্ষণে আমি সত্যি সত্যি লজ্জা পাই। সত্যি। সেই সোনার দিনগুলোকে যে কেমন করে ভুলে গেলুম আমি!

শুনে নকুলের গলায় চাপা অনুযোগ, তুমি ভুলতে পার, কিন্তু আমি ভুলিনি। গলায় খুব প্রত্যয় ফুটিয়ে বলে সে, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দ্যাখ। নকুল পরীক্ষার্থীর মতো প্রস্তুত হয়।

আমিও কেমন করে যেন ওর কথার ফাঁদে আটকে গিয়ে পরীক্ষকের পদে অবতীর্ণ হই। এবং একটু বাদেই সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় নকুল। ছেলেবেলার সব ঘটনা অনুপুঙ্খসহ ষোলআনা মনে আছে ওর!

অবাক হয়ে বলি, তোর দেখছি সবকিছুই মনে আছে!

ততক্ষণে খুব মন-খারাপ শুরু হয়েছে আমার মধ্যে। বলি, ইস্, আমার তো অধিকাংশ কথাই মনে নেই রে।

রোগীর রোগটা সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পেরে সুচিকিৎসকের সারা মুখে যেমন করে ফুটে ওঠে আত্মপ্রসাদের চাপা অহংকার, এবং সেই সুবাদে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ততক্ষণে নকুলের সারামুখে ফুটে উঠেছে সেই জাতের হাসি ও উজ্জ্বলতা। বলে, তুমার মনে থাকবে কী করিয়া? তুমার তো সারাজীবনটাই পুঁজি। আমার যে ওই ছেলেবেলাটুকু ছাড়া আর পুঁজি বলতে কিছুই নাই।

বাপরে! কথার কী বাঁধুনি নকুলের! মনে মনে চমৎকৃত হই আমি। আহা রে, খুবই বোধ করি অনটনের মধ্যে রয়েছে বেচার! নইলে, সারা কৈশোর জুড়ে অত অত কাজ করে দেওয়ার পরও যে-কিনা একটি দিনের জন্যও হাত পাতেনি আমাদের কাছে, সেই-সে আজ বড়লোক বন্ধুর থেকে সামান্য সাহায্যের আশায় কতই না মনোহর ফাঁদ পাততে চাইছে! একবার মনে হয়, দুম করে কিছু টাকা এগিয়ে দিয়ে ওর নিরুপায় খেলাটা ভেঙে দিই। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয়, হঠাৎ টাকা দিতে গেলে

যদি আরও অপ্রস্তুত বোধ করে বেচারা! এই এতদিনে কতখানি বদলেছে ও, তা তো আমি জানি নে। যদি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, এ কী, টাকা দিচ্ছ কেন? টাকা কে চাচ্ছে তুমার থিকে?

সাতপাঁচ ভেবে ওপথ আর মাড়াইনে আমি। থাক, যখন চাইবে, তখনই না হয় দেওয়া যাবে। বলি, নিতে তো ইচ্ছে করে, কিন্তু বুনো গাছের চারা, শহুরে বাগানে কি বাঁচবে? এখন তো সব হাইব্রিডের গাছ।

আমার কথায় কেমন জানি ম্রিয়মাণ দেখায় নকুলকে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চল, হাঁটি। বুসিয়া থাকিয়া কী লাভ?

হাঁটতে হাঁটতে মেলার মধ্যে ঢুকে পড়ি আমরা।

একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ায় নকুল। বলে, আইস, টুকচার বসি ইথেনে।

দোকানের সামনে পাতা বেষ্টিতে বসি দুজনে। জিলিপি ভাজা চলছে। হলুদ রঙের জিলিপি ভাঁই হয়ে রয়েছে পেতলের বারকোশে।

নকুল খুব ফুরফুরে গলায় হাঁক পাড়ে, একশো গেরাম করিয়া জিলাবি দাও তো হে দু'জায়গায়।

আশপাশে হাঁটাহাঁটি করছিল লোকজন। তাদের মধ্যে পরিচিত কাউকে দেখলেই মিটিমিটি হাসছিল নকুল। আর, কে যেন ওকে কৈফিয়ত তলব করেছে, এমন ভাব করে আগ বাড়িয়ে বলছিল, ছেল্যাবেলার বন্ধু, কতদিন বাদে দেখা... সেই তরেই...। জিলিপি খেতে খেতে নকুল শুধায়, ক'দিন আছ?

বলি, পরশুই চলে যাব।

—সে কি! মেলা শেষ হওয়ার আগেই?

—উপায় নেই। আমি ম্রিয়মাণ হাসি, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে অফিসে।

—কাজ রইলে তো—। নকুল বুঝি মেনে নেয় আমার যুক্তিটা। বলে, গাছটা তবে আমি পরশুই দিয়া আইসবো তুমার বাড়িতে।

—এবারে থাক না। আমি ইতস্তত করি। আসলে, বাগানের নেশাটা ছেলেবেলা থেকেই ছিল আমার। নেশাটা কাটেনি এখনও অবধি। শহরতলিতে বাড়ি করবার পর অনেক ফুলের গাছ পুঁতেছি সামনের একচিলতে বাগানে। তবে দু-আড়াই কাঠা জমির ওপর বাড়ি, তার থেকেই একটুকরো বাগানের জন্য রাখা, এখন গিজ-গিজ করছে গাছে। গৃহিনীর কড়া নির্দেশ, গাছ আর বাড়ানো চলবে না কিছুতেই। বাগানটাকে জঙ্গল বানাতে চাও নাকি?

নকুলের দিকে তাকিয়ে বলি, এবারে কি নিয়ে যেতে পারব রে? এবারে লটবহর ঢের। পরের বারে না হয়—!

—পরের বারে—? নকুল যেন ভাবনায় ডুবে যেতে থাকে।

জিলিপি খাওয়া শেষ। নকুল উঠে দাঁড়িয়ে হাফশার্টের পকেট থেকে একটা ময়লা নেতানো পঞ্চগশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে দেয় দোকানদারের দিকে।

—কী করছিস? আমি হাঁ-হাঁ করে উঠি, আমি দেব।

নকুল ঠাণ্ডা চোখে তাকায় আমার দিকে। বলে, তুমি কেন দিবে? আমিই তো ডাকিয়া আনিয়া খাবালাম তুমাকে। প্রায় জ্বরদস্তি দাম মেটায় নকুল।

আমি আর বাধা দিইনি ওকে। কিন্তু পার্শ্ব খুলে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে বুকপকেটে রাখি। যাতে নকুলের দিক থেকে প্রস্তাবটা এলেই টাকাটা বের করে তুলে দিতে পারি ওর হাতে। আমার মন বলছে, আমার কাছে কিছু সাহায্যের প্রস্তাব রাখবার জন্য হাঁকুপাকু করছে ও। কিন্তু নিতান্তই সঙ্কোচবশত কথাটা উত্থাপন করতে পারছে না। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি, অন্য বন্ধুদের মতো এড়িয়ে যাব না ওর প্রস্তাব। কারণ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, এতদিন বাদে দেখা হলেও, সেই ছেলেবেলার নকুলটাকে মনে মনে আমি ভালোই বাসি।

মিঠাইয়ের দোকান থেকে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করি। মনে মনে বাড়ি ফিরতে চাইছিলুম আমি। অনেকক্ষণ কাটালুম মেলায়। ভিড় আর ধুলোয় এতক্ষণে একটু একটু মাথা ধরতে শুরু করেছে। বলি, তুই এখন কোথায় যাবি?

আমার প্রশ্নটা বুঝি ঝরতে পারেনি নকুল, বলে, কেন? অন্য কুনোদিকে যাইতে চাচ্ছ তুমি? চল, আমার কুনো আপত্তি নাই। মেলা ভাঙা অবধি আমি মেলাতেই থাকি রোজ।

বলি, না, মানে, আমি এবার বাড়ি ফিরতে চাইছি।

নকুল অবাক হয়, এফুনি? এফুনি বাড়ি গিয়া করবে কি? অতদিন বাদে দেখা, একটু গল্পগুজব করি।

সরাসরি না বলতে পারিনে। পুরনো জায়গাটাতেই গিয়ে বসি।

কেমন জানি উসখুস করছিল নকুল। চকিতের তরে মনে হল যেন ওর চোখের তারায় চাপা লোভ দেখতে পেলুম। আমার মন বলছিল, কিছু একটা বলতে চাইছে নকুল, প্রস্তুত হচ্ছে মনে মনে, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, কথাটা পাড়তে পারছে না। তবে আমার এও মনে হল, খুব শিগগির কথাটা পাড়বে নকুল। খাওয়া-দাওয়ার পরও টেনে এনে বসিয়ে যেভাবে ভাঙা খেলাটা আবার খেলতে শুরু করল,

তাতে করেই আমার মনে হল তেমনটা। নকুলের এই খেলাটাকে মনে মনে প্রশয় দিলুম আমি। বাঁহাত দিয়ে বুকপকেটে রাখা নোটটাকে আলগোছে ছুঁলুম। তবে আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল, মাত্র পাঁচশো টাকায় খুশি হবে না নকুল। সে মনে মনে আরও বড় দাঁও মারতে চাইছে। বিশেষ করে সে যখন ইতিমধ্যে লোকমুখে খবরটা জেনেই গেছে যে, আমি মানুষটা পুরোপুরি অন্য বন্ধুদের মতো নই। এখনও অবধি আত্মীয়স্বজন কিংবা ছেলেবেলার লোকজনেরা হামলে পড়লে কিছু দিই-টিই। একেবারে খালি হাতে ফিরিয়ে দিই না।

এটা অবশ্য পুরোপুরি মিথ্যে নয়। তেমন কেউ সামনে এসে হামলে পড়লে ফিরিয়ে দিতে কেমন যেন বাধে। কেবলই মনে হয়, তাতে করে নিদারুণ নিন্দে হবে আমার। তা ছাড়া, আরও একটা কথা আছে। অনটনগ্রস্ত আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্য করতে গিয়ে যে মনে মনে এক ধরনের আত্মশ্লাঘা বোধ করি, এটা তো একেবারে মিথ্যে নয়। ওদের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করবার বেলায় প্রতিক্ষেপেই আমি ওদের চেয়ে অনেকখানি উচ্চাসনে স্থাপন করি নিজেকে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ওই উচ্চাসনে বসবার সুখই আলাদা।

টেনে এনে বসাল বটে, কিন্তু কিছুই বলছে না নকুল। অন্ধকার আকাশের গায়ে চোখ বিঁধিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। নিঃশব্দে বিড়বিড় করছে ঠোঁটদুটি। দেখে মনে হয়, বুঝি আকাশের তারা গুনছে।

একসময় বলি, কতক্ষণ বসবি? বাড়ি যাবিনে?

নকুল আমার দিকে মুখ ফেরায়। বলে, হুঁ, যাব। আসলে, ছেল্যাটার আইস্‌বার কথা মেলাতে। যে-বাড়িতে গরু চরায়, এমনই চামার, মেলার দিনগুলোতেও একটু জলদি-জলদি ছুটি দেয় না। ছুটি পাইয়া যদি আসে মেলাতে, আমাকে দেখতে না পাইলে মন খ্যারাপ হবে। তাবাদে, মেলায় আইলে আমার থিকে দু-চার পয়সা পায় তো। নকুল ম্লান হাসে।

ততক্ষণে আমি পুরোপুরি বুঝে গিয়েছি, কেন আমাকে আটকে রেখেছে নকুল। ছেলেটা এলে-পরে, তাকে স্বচক্ষে দেখলে-পরে, খুব মায়া জমবে আমার বুকে, আর তখনি সে এমন কিছু চেয়ে বসবে ছেলেটার জন্যই, যা আমি হয়তো বা ফেলতে পারব না।

একটুবাদে নকুলের ছেলে এল। চামচিকের মতো শীর্ণকায় চেহারা। মাথায় খোঁচাখোঁচা চুল। পিটপিট করে দেখছিল আমাকে।

নকুল বলে, দেখু কি, তোর এক জেঠা, গড় কর।

যদুর জানি, নকুল আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। এমনিতেই তো গরিব-গুরবোদের ছেলেরা একটু বেশি বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়, তার ওপর, আমি যখন ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হই, ও তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়ত। বারবার পরীক্ষায় ফেল করায় ক্লাস ফোরে এসে ধরে ফেলি ওকে। সেই হিসেবে ওর বয়েস তিন বছরের বেশিও হতে পারে আমার চেয়ে। ফলে, সম্পর্ক বানাতে গেলে আমি বড়জোর নকুলের ছেলের কাকা হতে পারি, জ্যাঠা কিছুতেই নয়। কিন্তু বিষয়টা আমাকে তিলমাত্র বিস্মিত করে না। কারণ আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি এই ব্যাপারটা। গ্রামাঞ্চলে সম্পর্ক ব্যাপারটা বয়সে ছোট-বড়'র ওপর নির্ভর করে না, করে আর্থিক এবং সামাজিক কৌলিন্যের ওপর। বয়েসে বড় গরিব মানুষটি যেমন অবলীলায় সাত-ছোটকে দাদা বলে ডাকে এবং অপরপক্ষ সাড়াও দেয়, তেমনই সাত-ছোট সচ্ছল পরিবারের ছোকরাটি গরিব অথচ বয়স্ক মানুষটিকে স্বচ্ছন্দে নাম ধরে ডাকে। কাজেই, আমি প্রতিবাদ না করে অবলীলাক্রমে নকুলের ছেলের জ্যাঠা বনে গেলুম। মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে নকুলের ছেলে। আমি ওকে হাত ধরে টেনে তুলি। বলি, কী নাম?

—সুবল। খুব নম্র গলায় জবাব দেয় ও।

অনেকক্ষণ থেকে জামার পকেটে পাঁচশো টাকার নোটখানা খসখস আওয়াজ তুলে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল। এবার আমি আলটপকা একটা সুযোগ গ্রহণ করি। পকেট থেকে নোটটাকে বের করে মেলে ধরি সুবলের সুমুখে। বলি, নাও, ধর। মিষ্টি খেও।

নেবে-কি-নেবে না, দোনামোনা করছিল সুবল, সরুপানা হাতখানি প্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল টাকাগুলোর দিকে, আচমকা হাঁ-হাঁ করে ওঠে নকুল, কচ্ছ কি? বাচ্চা ছেল্যার হাতে অত টাকা দেয় কেউ? নোটশুধু আমার হাতটাকে আলগোছে সরিয়ে দেয় সে। চটজলদি হাফশার্টের পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার কয়েন বের করে এগিয়ে দেয় সুবলের দিকে। বলে, যা, জলদি জলদি যা-খাওয়ার খায়্যা লে। রাত হয়্যালো। কাল তোর গরু চরানো নাই? সুবল দৌড়ে চলে যায় মিঠাইয়ের দোকানগুলোর দিকে। নকুল এবার আমার দিকে তাকায়। বলে, রাত হয়্যালো, বাড়ি যাবে-নি?

আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম নকুলের দিকে। ছেলেকে আড়ালে পাঠিয়ে দিল, এবার নির্ঘাত কিছু একটা বলবে, এমনটা ভেবে নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে থাকি। তখনও অবধি আমার হাতে ধরা রয়েছে কর্করে পাঁচশো টাকার নোটখানি।

টাকাগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল নকুল। আমি হুল করে বলি, হ্যাঁ, এবার বাড়ি যাব। বলতে বলতে নোটটাকে বুক-পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে আমি পিছু ফিরি। বলি, চলি, অ্যাঁ? আমি হাঁটতে শুরু করি।

দশ পা'ও বোধ করি হাঁটিনি, পেছন থেকে ডাক দেয় নকুল, অমিত, শুন।

আমি পিছু ফিরে তাকাই ওর দিকে। দেখি, আমার দিকে খুব দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে ও। নিজের অজান্তে আমার হাত চলে যায় বুক-পকেটের দিকে। ভাঁজ করা নোটটাকে আলতো করে ছুঁই আমি।

পাশটিতে এসে নকুল বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

বলি, কিছু বলবি? বল না। বন্ধুর কাছে এত সঙ্কোচ কীসের? আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকি।

একসময় নকুল খুব ভেজা ভেজা গলায় বলে, আবার কবে দেখা হবে?

বাস্তবিক, এমন প্রশ্নর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি। বোকার মতো হাসতে থাকি। বলি, খুব শিগগির তো আর আসছিনে, আবার হয়তো-বা আসছে বছর মেলার সময়...।

চোখদুটো চিকচিক করছিল নকুলের। আমি খুব ব্যাকুল গলায় বলি, কিছু বলবি? বল না।

—না, কী আর বলব? খুব ত্রিয়মাণ মুখে বলে নকুল, ভালো থেকে। আবার আইলে যেন দেখা হয়। কখন যে আসো, চলিয়া যাও, খাটাটায়া ব্যস্ত থাকি, জানতেও পারি না...।

খুব ধীরলয়ে কথাগুলো বলতে বলতে নকুল, সম্ভবত ছেলের সন্ধানে, মিষ্টির দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

আমি পেছন থেকে নিষ্পলক দেখতে থাকি ওকে। কুঁজোপানা শরীরটাকে প্রাণপণে সোজা রাখবার চেষ্টা চালাতে চালাতে একসময় মানুষজনের ভিড়ে হারিয়ে যায় সে।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বুক-পকেটে রাখা নোটখানাকে বাঁ-হাত দিয়ে স্পর্শ করি। কানের লতি অজান্তে জ্বলছিল। নকুলের প্রতি যারপরনাই ক্ষোভ জন্মাচ্ছিল আমার মনে।

আমি তার ছেলেবেলার বন্ধু, আমাকে অতখানি অপমান ও না করলেই পারত।